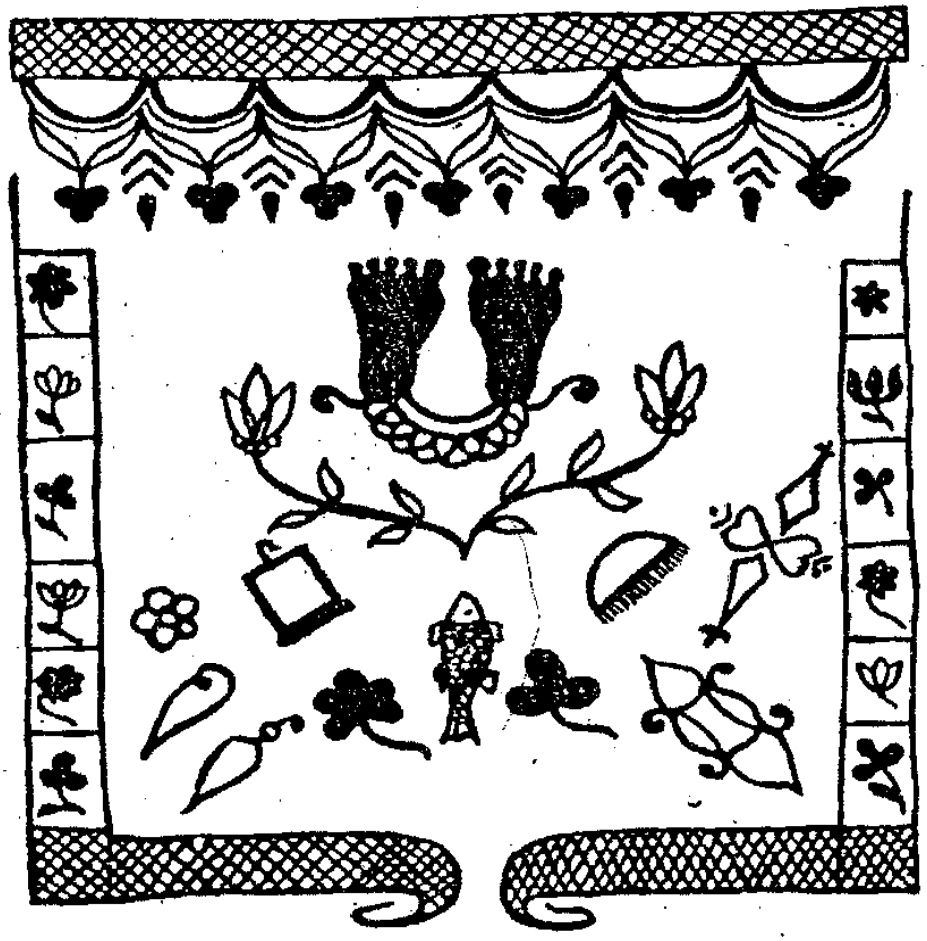

মুকুন্দ গায়েন

কয়েকজন মৌচোর অথবা একটি বাঘের গল্প

মানুষের রক্তের গভীরে ঢুকে আছে বনজঙ্গল, খানাখন্দ, পাহাড়পর্বত, নদনদী এইসব স্থাবর জঙ্গম। মানুষ তাই এখনও সভ্য পথচারীদের আগুনের সামনে স্তম্ভিত করে রেখে অনেকেই অরণ্যচারী হতে চায়। কেউ কেউ অরণ্যসম্পদ সম্বল করে জীবনজীবিকায় অতিবাহিত করতে চায় নিজ নিজ গোষ্ঠীকে। এই চাওয়াটির চাওয়া তো নেই। প্রকৃতি তো সবকিছু দিয়েই রেখেছে — শুধু সংগ্রহের অপেক্ষা। লোভলালসার বশবর্তী না হয়ে শুধু সংগৃহীত সম্পদে নিজের ক্ষুণ্নিবৃত্তি নিবৃত্তি করা।

যা হোক বেশি কথা না বাড়িয়ে বলি : আমরা হলাম গিয়ে 'হালুমের' দেশের লোক — জলজঙ্গলের মানুষ। আমাদের এক দিকে উত্তাল সমুদ্রের হাতছানি। অন্যদিকে জঙ্গলের ডাক। আমরা কেউ কাউকে উপেক্ষা করতে পারি না। ফলত আমরা কেউ কেউ বেরিয়ে পড়ি গজবের দুনিয়ায় আর ভেসে যাই আলিসান দরিয়ায়, লোভের বশবর্তী হয়ে লাভের বশবর্তী হয়ে।

মানুষের মধ্যে একটু আধটু লোভ তো থাকবেই — একটু আধটু লালসা তো থাকবেই, না থাকলে সে কিসের মানুষ; না থাকলে তো সে মাটির পিত্তিমে হয়ে গেল।

এই রকম এক লোভের বশবর্তী হয়ে মৌ ভাঙতে গিয়েছিল ফণী গায়েন (গুণীন), শিবে মণ্ডল (পাশ গুণীন), শিবের ছোট ভাই নিরঞ্জন, শরৎ মণ্ডল, টেকো শৈলেনের ছেলে ছোট নিরঞ্জন। ভরা অমাবস্যে তায় আমাবাচী (অম্বুবাচী)। কেউ জঙ্গলে ওঠে! হারামজাদা এ করেচে কী? তিথি নক্ষত্র মানামানি নেইকো। এদিকে ঈশানে মেঘ নৈর্ঋতে মেঘ। এ সময় কেউ জঙ্গলে ওঠে! এসব গ্রামমোড়লের কথা। আমার নয়।

ব্যাপারটা হয়েছে কী, ওরা গিয়েছিল কয়েকদিন আগে দেখে আসা এক মৌয়ের সন্ধানে। সড়কখালির মুখেই কিছুটা বেয়ে গেলেই — এক দু-আড়াই মণের মধুর চাক। একেবারে টসটস করছে। বেশি বৃষ্টি বাদলায় চাক রাখা যাবে না। 'মাছিতে সব খেয়ে লেবে।' অতএব হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে রাজেন বিশ্বাসের ভড়ের থেকে পাশ ডিঙি খুলে দে ছুট। — যাবি যা সোজ্নোখালি থেকে পাশ করে যা। তা নয় এক্কেবারে বে-পাশি।

চাকটা কাটবার পক্ষেও ভারী সুবিধা। হ্যালা বানগাছে (বাইনগাছ)। নিচ থেকে দাঁড়িয়ে কাটা যাবে — গাছয়ালের (যারা গাছে উঠে চাক কাটে) প্রয়োজন নেই। শুধু আড়িয়াল (আড়ি বা ধামায় কাটা চাক ধরে নেয়), বুলেনদার আর কাটিয়াল হলেই হবে। ওরা সব ছড়া ধরে বুলেন বাঁধতে লাগল -

দক্ষীরায় বলে বাবা
বনচাপলি মধু পাবা
সায়
সাবা দ্যাও দক্ষীরায়ের পায়
বনে আছে গাজীপীর
তার নামে চড়াও ক্ষীর
সায়
সাবা দ্যাও গাজীপীরের পায়
বনে আছে বোন বিবি
দ্যাওড়ায় গে সিন্নি দিবি
সায়
সাবা দ্যাও বোনবিবির পায়
জলে আছে কালুরায়
যার নামে যোম ডরায়
সায়
সাবা দাও কালুরায়ের পায়
বেনের ভাই শাজঙ্গলী
তার নামে দু হাত তুলি
সায়
সাবা দ্যাও শাজঙ্গলীর পায়।... ইত্যাদি ইত্যাদি

এদিকে বুলেন বাঁধা শেষ। (বুলেন মূলত হেঁতাল বা বোগড়া পাতার কাঁচা-শুকনো পাতা দিয়ে বাঁধা হয়। কেননা ধোঁয়ার প্রয়োজন; আগুনের কোনও ভূমিকা নেই।) আর এদিকে শুরু হয়ে গেল কী বৃষ্টি কী বৃষ্টি! যেন ক্ষমা নেই — ক্ষান্তি নেই। আকাশও গাঢ় তমাল তমসায় সমাচ্ছন্ন। সকাল কী দুপুর বোঝা যাচ্ছে না। দু হাত দূরের মানুষের কাছে কথা পৌছে দিতে হচ্ছে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। জঙ্গলের ভেতর দেখা যাচ্ছে না কিছুই। গাছগুলোও আর মাথা নেড়েও কথা কইছে না। শুধু নিবিড় নিষিক্ত ধারা বর্ষণ সইছে।

গামছার আড়ালমাড়াল করে বুলেনগুলো ধরানো হলো। চাকে ধোঁয়া দিয়েছি কী দেয়নি। ইতোমধ্যে ঘটে গেল এক প্রলয়ংকর ঘটনা। যেন বিদ্যুৎ বহ্নি। ফণী গায়েনের গায়ের উপর দিয়ে শিবের ঘাড়ের উপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঘ। এঁড়ে বাঘ। বেশ হৃষ্টপুষ্ট তাগড়াই ডোরাকাটা কালো কেঁদো। ফণী গায়েন তখন বাঘকে জাপটে ধরেছে। বাঘের টার্গেট মিস্ হবার জো নেই। ফণী গায়েনকে নির্মম ভাবে আহত করে শিবেকে নিয়ে গ্যাছে ততক্ষণ। চোখের নিমেষ ফেলা মাত্র। বুলেনগুলো সেঁতিয়ে গ্যাছে। ধূপের ধোঁয়ার মত একটু ক্ষীণ রেখাঙ্কিত ছাড় আর তুমুল বর্ষণ ছাড়া চারদিক থ হয়ে রয়েছে — থ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে নিরঞ্জন। ফণী গায়েনকে পাওয়া যাচ্ছে না — শরৎকে দেখছে না নিরঞ্জন ছোট নিরঞ্জনই বা গেল কোথায়? নিরঞ্জন এ কী দুঃস্বপ্ন দেখছে — নাকি বাস্তব। যদি বাস্তব হয় তবে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি কেন? বড়দা, বড়দা কোথায়? সম্বিত হারানো নিরঞ্জন দেখছে নৌকোর তলা থেকে ভুস করে ভেসে উঠল দুজন। শরৎ আর ছোট নিরঞ্জন। ফণী মামা কোথায়? শরৎ বলল — আর দেরি করিস নে নিরঞ্জন, ওদের দুজনকেই বাঘে নিয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি ডিঙিতে উঠ। কিন্তু নিরঞ্জনের নৌকোয় ওঠবার ক্ষমতা নেই। শরৎ এসে ধরে ধরে নিরঞ্জনকে নৌকোয় তুলল। নৌকো রশিখানেক গিয়েছে কী যায়নি — ফণী গায়েন চ্যাঁ চ্যাঁ করে ডাকল ওদের — শরৎ আমারে ফেলে যাস নে আমি আছি। নিরঞ্জন বলল — আরে ফণী মামা আছে — ফণী মামারে তুলে নে। কিন্তু এ কোন ফণী মামা — যার মাথার চামড়া সহ চুলগুলো এসে ঝুঁকে পড়েছে মুখের উপর। নাকের বাঁ লতি ছেঁড়া। সারা বুকে শান দেওয়া ছুরির নখরাঘাত। একেবারে ফালা ফালা করা। দেহের রক্ত প্রায় নিঃশেষিত। ওরা চটপট পরনের গামছা খুলে বেঁধে দিল সবখানে। মাথার চুল সহ চামড়া টেনে পিছনে গামছা দিয়ে বেঁধে রাখল টানটান করে। তারপর ভেতর গাঙ দিয়ে এসে উঠল রাজেন বিশ্বাসের ভড়ের গায়ে। কিন্তু বাওয়ের আগে বার্তা ছোটে। ফণী গায়েন সবার প্রিয় মানুষ। সব ওই বিষ্টি বাদলায় 'নড়িয়ে নড়িয়ে' আসছে। ডাক্তার কবিরাজ সব হাজির। শশধর ডাক্তার সেলাইমেলাই-এর যন্তরপাতি নিয়ে এসেছে, নিয়ে এসেছে ওষুধপত্তর। শশধর হাতুড়ে হলে কী হবে, গাঁ-গেরামের পক্ষে বড় সার্জেন। হাত কথা বলে। আর একটা বিশেষ কথা হলো হস্পিটালে ভর্তি করা যাবে না। কারণ বে-পাশি মউলের কোনও কদর নেই। অতএব বাড়িতে রেখে ট্রিটমেন্ট করাই ভালো। কথায় আছে বাঘে ছুঁলে ৩৬ ঘা। কিন্তু ফণী গায়েনের সেরে উঠতে ছ মাসের ধাক্কা। সেরে উঠল ফণী গায়েন। কিন্তু মুখ ঢাকা গেল তারকনাথ অপেরার বোন বিবি ধনামৌলে পালায় সাজনদার ও দক্ষীরায়ের অভিনয়ে দক্ষ শিরনাথ মণ্ডলের। গোষ্ট গায়েন দুঃখ করে বলেছিল শিবে নেই। এ ক্ষতি অপূরণীয়। কাকে দিয়ে আর ওই অভিনয় করাব। তারপর আর বেশি দিন গোষ্ট গায়েন বাঁচেনি। বছর তিনেক পরে সেও দেহ রাখল একদিন।

২

আমার শৈশব কৈশোর কেটেছে খুবই নিঃসঙ্গতায়। যৌবনেও কি খুব সঙ্গতায় কেটেছে? না, প্রৌঢ় বয়সেও আমি আমার মুদ্রাদোষে একা। বিবিক্ত। বরং বলা যায় প্রাকৃতিক নিসর্গ আমাকে টেনেছে বেশি।... আমি আমার শৈশবে পেয়েছিলাম একটি খাল। যার জল টলটল করছে গ্রীষ্মের দিনে। যার জলে এসে পড়েছে উলুফুলের ছায়া — ফুলকপি মেঘের থোপা থোপা দ্যুতিময় মুখ — আমি বটের শিকড়ে শুয়ে শুয়ে এইসব ছবি দেখতাম। দেখতাম পানকৌড়িদের ডুবে ডুবে মাছ ধরবার কায়দা। কখনও তাদের সঙ্গে উড়াল

দিতাম মেঘপরীদের রাজ্যে। স্কুল পাঠশালা, আমাকে খুব বেশি স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারে নি। আপনারা ভাবছেন আবার এ সব গল্প কেন? এ গল্পের ভেতর একটা বিষধর সাপের গল্প লুকিয়ে আছে।... গ্রীষ্মের গরমে ওই বটের শিকড়ের উপর শুয়ে শুয়ে — ঝর্ঝর করে কাঁপা ওই পাতাগুলোর দিকে তাকিয়ে — আমি আমার দুঃখ খুঁজে বেড়াতাম। তো, একদিন একটা গোখরো সাপ — আমার মাথার কাছাকাছি এসে ফণা ধরে — থমকে রইল। আমি কিছুই জানি না। সেও নিঃশব্দ আমিও নিঃশব্দ। কতক্ষণ সে এসে দাঁড়িয়েছে আমি জানি না। হঠাৎ উপরের দিকে তাকাতেই আমার চোখ চড়ক গাছ। সমস্ত ইন্দ্রিয় শিথিল। আমার দেহে মনে এক অন্ধ হিমযুগ এসে পড়েছে যেন। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কলার মান্দাসে আমার ভেসে যাওয়া দেহ। কিছুক্ষণ বাদে বোধ ফিরে পেতেই — আমি শুয়ে শুয়ে পায়ের দিকে এগুতে লাগলাম। এবং তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দেখলাম। সাপটি মাথা নিচু করে ফণা গুটিয়ে শিকড়ের মধ্যে ঢুকে গেল। আমি তার জন্য অনেকক্ষণ বসে রইলাম।

মাকে এ কথা জানাতে সাহস হয়নি। বলেছি অনেক পরে।

ঘরে বসে শুনেছি বাঘের গর্জন। ভাদ্র আশ্বিনে কী ভয়ঙ্কর সেই ডাক। তখন শুনতাম বাঘের গর্জনে, সিংহের গর্জনে পুরুষের শিশ্নদেশ ছিঁড়ে পড়ে। পরে জেনেছি ওই ডাক মোটেও ভয়ঙ্কর নয়। এক মিলনাকাঙ্ক্ষার আর্তি।

আমি তখন ক্লাশ থ্রিতে পড়ি। পড়তে হয় বলে পড়ি। মা'র দুঃখ দেখে পড়ি। আমার বয়সী ছেলেরা তখন ফোর ফাইভে পড়ছে। আর আমি কিনা থ্রি। এই সময় আমাদের গ্রামে একবার একটা বাঘ ঢুকে পড়ে — গ্রীষ্মের দিন। চাঁদের রাত। আমি উঠোনে শুয়ে ঘুমুচ্ছি। মা ঘোল টানছেন। এর মধ্যে হইচই — চিৎকার চ্যাঁচামেচি। বাবুর গোয়ালে বাঘ ঢুকেছে — তিরকুটি মণ্ডলের বাড়ি। এইসব পুরানো কথা বলার অনেক হাঙ্গামা। কে এই বাবু, কে এই তিরকুটি মণ্ডল — তাদের পরিচয় একটু আধটু দিয়ে রাখি। ভালও লাগবে। বাবু হলেন — বিধুভূষণ ভট্টাচার্য। হাওড়ার অধিবাসী। তাঁর এখানে ১০৬ বিঘে জমি ছিল — যার দেখভাল করতেন তিরকুটি মণ্ডল। অফিসিয়াল নাম কানাইলাল মণ্ডল। কিন্তু তাঁর অসম্ভব বাবুয়ানি ছিল। সপ্তায় সপ্তায় ছাগল-ভেড়া মেরে গ্রামের মানুষদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা — কথায় কথায় একশো টাকার নোটে তামাক গুটিয়ে টানা। সারা বাড়িতে হাঁসমুরগী ছাগল-ভেড়ার বিষ্ঠায় আবিষ্ট। কোন ভ্রূক্ষেপ নেই — খাদ্য শৃঙ্খলা বলেও কিছু নেই — সারা বাড়ি ভাতে জলে ছড়াছড়ি। গ্রামের লোকে এই ভিরকুটি সহ্য করবে কেন। তারা বলাবলি করতে থাকে — দ্যাখ তিরকুটি তোর ভিরকুটি বেশিদিন থাকবে না। সেই থেকে কানাইলাল মণ্ডলের নাম তিরকুটি হলো। সেই তিরকুটি মণ্ডলের বাড়িতে বাঘ। বাবুর তখন প্রায় পঞ্চাশ ষাটটি মিলিয়ে গোরু মোষ। সাঁঝে রাতে এসে বাঘে একটা গরু ধরল। তারপর আর একটা। এর মধ্যে কয়েকজন অসম সাহসী যুবা হ্যাজাক ধরিয়ে পটাপট গরুগুলোকে মাঠে ছেড়ে দিল। না হলে কেষ্টর জীব যে, বেঁধে খাওয়ানো হয়। পাপ রাখবে কোথায় তারা। বাঘ এই যুবাগণের সাহস রেখে হতচকিত হয়ে একটু দূরে সরে গেল — গরুগুলো সব ছাড়া। বাঘ এবার মাঠে তাড়িয়ে তাড়িয়ে গরু ধরতে লাগল। এইভাবে ২৩টা গরু মেরেছিল বাঘে। ভোর না হতেই — বাঘ মামা হা-ক্লান্ত। খেয়েছে যেমন মেরেছেও তেমন। আমাদের গ্রামের গুণিন তখন বাইদেব বাছাড়। আবার হাঙ্গামা। বাইদেবের ভাল নাম বাসুদেব। কিন্তু ওই যে উঠল বাই তো কটক যাই গোছের মানুষ সে। সব কাজেই তার বাই বেশি। সেই থেকে সে বাইদেব। সে এসেছিল ভোর রাতে হাগতে অনন্ত মিস্ত্রির বেড়েখানায়। এবং সেখানেই — বাঘের সঙ্গে সাক্ষাৎ — বাইদেবের হাগা তখন মাথার কাঠে — কোমরের কষি খুলে গামছা কোথায় সে জানে না। বউ বলল — ব্যাপার কী? — আরে পরে শুনো। ঘরে উঠে দোর দ্যাও। কেন? — আরে আরটু হলিই — আমার বাঘের প্যাটে যাতি হতো। তোমার গামছা কোথায়? ন্যাংটো কেন? বাইদেব বউয়ের উপর একখানা কাঁচা খিস্তি ঝেড়ে দিয়ে লুঙ্গি পরতে লাগল। বউ বলল — কেন তুমি যে কাল বুললে — বাঘের গালে আমি খিল এঁটে দিছি। বাইদেব আবারও একটা কাঁচা খিস্তি আওড়ে — এক দলা থুতু ছিটিয়ে বলল — জানোস্ না গ্রামে খিল খিলেন মন্তরও খাটে না।

৩

সেই বাঘ মারা পড়ল ৫নং জেলেখালি গিয়ে। হাজার হাজার মানুষ তেড়ে যাচ্ছে বাঘটার পেছন পেছন হৈ হৈ করতে করতে — বাঘটা তখন দিশেহারা। সে নিরুপায় হয়ে হাজারি সরদারের ছিটেবেড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়ল। রক্ষে যে ঘরের ভেতর তখন কেউ ছিল না।... দয়াপুরের পক্ষে বিনোদ রপ্তানের বন্দুক আর ৫নং জেলেখালির পক্ষে ইন্দির মণ্ডলের বন্দুক। খড়ের চাল ফাঁক করে — বাঘের গায়ে গুলি ছোঁড়া হল। বাঘ মরল। কিন্তু দাবি উঠল দুই পক্ষেই; কেউ বলল — ইন্দিরদার গুলিতে মরেছে, কেউ বলল — বিনোদবাবুর গুলিতে। এই নিয়ে মারামারি হৈ-হট্টগোল। শেষ অব্দি দয়াপুররাই বাঘ নিয়ে চলে এলো — কারণ ইন্দির মণ্ডলের ছারাগুলি। বিনোদবাবুর বুলেট। অতএব বাঘ আমাদের। আমরা ক্ষতির শিকার হয়েছি বেশি।

বাঘ চলে এলো — দয়াপুর মাঠে — আমরা বাঘ দেখতে ছুটলাম। সেই আমার প্রথম বাঘ দেখা। গায়ে কালো দাগ আর হলুদের ছোপছাপ। মৃত বাঘের মুখে স্মিত হাসি — মাপা হলো হেড টু টেল — ৮ ফুট ৯ ইঞ্চি। আমার বেশ মনে আছে। আগফা ক্লিক থ্রি ক্যামেরায় ছবি উঠল। আমিও বাঘের সঙ্গে আর বড়োদের সঙ্গে বাংলা পাঁচের মত মুখ করে কখন যে উঠে গেছি জানি না। জেনেছি — বিনোদকাকুর দেয়ালে ছবি দেখে। তখন অবিশ্যি বাঘ মারলে তিরস্কার নয় পুরস্কার। বাঘমারা বন্ধ হলো বাহাত্তরের আইনের পর। তারপরেও গ্রামবাসীদের হাতে অনেক বাঘ মারা পড়েছে। আমিও অনেক বার আমার পেশা বদলাতে বদলাতে বাঘের সম্মুখীন হয়েছি। বিপদের হাত থেকে বেঁচে ফিরে এসেছি। সে সব গল্প বারান্তরে বলা যাবে।

৪

সুন্দরবনে শুধু বাঘ নয়। বিভিন্ন শ্বাপদের আবাসস্থল। এখানে বাঘের চেয়ে সাপেরও উপদ্রব খুবই। কেউটে, কালাজ, গোখরো, পদ্ম গোখরো, শঙ্খিনী বা শাঁখামুটি, চক্কুরে বোড়া, জলকেরালি — এগুলো সবই বিষধর সাপ। নির্বিষ সাপের মধ্যে — লাউডগা, হেলে, হলদেপোড়া, দাঁড়াস, হল্‌হলে বা হলধর, ঘরচিতি ইত্যাদি। এর মধ্যে কালাজ ও জলকেরালি সাপের বিষ অতি

তীব্র। কালাজের বিষের প্রক্রিয়া শুরু হয় ধীরে ধীরে। কিন্তু জলকেরালি সাপের বিষ নাকি সাথে সাথে ক্রিয়া শুরু করে দেয়। লোকপ্রবাদে আছে যে, নদীর এবাঁকে কামড়ালে — জলকেরালি ওবাঁকে গিয়ে মাথা তুলে দেখে যে কাটিঘায়ের রোগীর মান্দাস জলে ভাসছে কিনা। জলকেরালি সহজে কামড়াতে চায় না; অত্যন্ত বিরক্ত না হলে। শাঁখামুটিও বিরক্ত না হলে কামড়াতে চায় না। শাঁখামুটি বা শঙ্খিনী কালাজ ধরে খায়। সেই সাপের সংখ্যা দিন দিন সুন্দরবনে হ্রাস পাচ্ছে। খুবই শঙ্কার কথা।

সুন্দরবনের মানুষ বাঘের চেয়ে সাপের ভয় পায় বেশি। আর এই ভয় থেকে জন্ম নেয় ভক্তির। মনসা পূজার প্রচলন প্রায় ঘরে ঘরে। দেবীর মূর্তি এখানে পূজিত হয় খুবই কম। পূজিত হয় একটি ক্যাকটাস প্রজাতির গাছ। আমরা যাকে বলি মনসাসেজি। শ্রাবণ সংক্রান্তিতে — সেই সেজি পূজিত হন।

বোন বিবি। নট্ বন বিবি। বোন বিবি বন রক্ষা করেন না। শুধু বিপদগ্রস্ত মানুষের রক্ষা করেন মাত্র। এটি লৌকিক বিশ্বাস। তাই গ্রাম বা গ্রামের উপান্তে তাঁর দ্যাওড়া অর্থাৎ পূজা ঘর থাকে। মাঘ সংক্রান্তি ও ফাল্গুনী পূর্ণিমায় বিবির দ্যাওড়ায় দ্যাওড়ায় সিন্নিভোগ চড়ে। এখানে ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয় না। হয় মূল গুণিনের। বোন বিবি জহুরীনামা পুঁথিটি তখনই পঠিত হয়।

আবার মাঝে মাঝে ভাদ্র আশ্বিনে গুজব ছড়ায় — পলার ভেতর থেকে সাপ বেরুচ্ছে। গৃহস্থের জ্যেষ্ঠ ছেলেকে দংশন করে — কোথায় যে সাপ মিলিয়ে যাচ্ছে কেউ জানে না। তা কী করতে হবে? — পলা হাত থেকে খুলে ফেলে দিতে হবে। তা দাও। শুধু দিলে হবে না। — তো? — নদীতে গিয়ে দিয়ে আসতে হবে। কী রকম? সাতজন এয়োকে সংগে নিয়ে মাটির হাঁড়িতে সাতখানা পিঠে আর সাতটা প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে আসতে হবে সাতদিন। সা-ত দিন? বলো কি? এখন জানো মাটির হাঁড়ি কলসীর দাম কত হয়েছে? — ও, পারো তো তোমার বাপঘরে গিয়ে দিয়ে এসো।

এসব স্বপন দেখে কারা?

একবার ভাই কাপড়ের বাই উঠল। ভাই, বোন বা দিদিকে কাপড় দিয়ে আসবে। — ভালো ভালো। কিন্তু তার পর বছর বোন কাপড়ের ধুয়ো উঠল। এখন উপায়? চাষী গালে হাত দিয়ে বসে। এখন ছ সাতটা সম্বন্ধির কাপড় কিনতে কিনতে চাষী ফতুর না হয়ে যায়। এই রকম সব গুজব আগাগোড়া ঘটে আসে ঘরে ঘরে।

একবার এক আধপ্রৌঢ়ের স্ত্রী বিয়োগের কান্না শুনেছিলাম পাশে বসে। সে কি কান্না। কিছুতেই কান্না থামানো যায় না। এ যেন সেই ঋক্‌বেদের যম মরে গেলে — যমীর কান্না। কিছুতেই চোখের জল, হা হুতাশ, কান্নাকাটি বন্ধ হচ্ছে না। দেখে দেবতারা সিদ্ধান্তে এলেন, যমীর ঘুমের খুব প্রয়োজন। তাঁরা কালো আবরণের সৃষ্টি করলেন। যমীর নার্ভ শিথিল হয়ে এলো। কালনিদ্রায় পেয়ে বসল তাকে। এইভাবে শোকের নিবৃত্তি। আর দিনরাত্রির প্রচলন।

কিন্তু প্রৌঢ়ের রাত্রি যাপনের পরেও দেখি সেই কান্না। — মশাই হলো কী। — কী আর হবে দাদা। বুকি আমার এক সাঁঝাল আগুন জ্বেলে গেছে। — আগুন নেভানোর চেষ্টা করুন। — কী করে করব? আমার যদি আর এট্টা বউ থাকতো — তা জ্বালা জুড়োতি পারতাম। এ জ্বালা যাগো বউ মরেনি — তারা বোঝবে না। পরে সেই প্রৌঢ়ের বিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত জ্বালা জুড়োয়নি। — মশাই জ্বালা কী জুড়োচ্ছে — তা পেরায় বারো আনা উপশোম। — আর চার আনা জুড়িয়ে ফেলুন পরে বুঝবেন জ্বালা কাকে বলে। — সে তো লেজ থাকলি গায়ে এট্টু-আধটু কম তো লাগবেই দাদা।